উনসত্তরের মহান গণঅভ্যুত্থান

তোফায়েল আহমেদ

আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন। '৬৯-এর গণআন্দোলনের দিনগুলি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কালপর্ব। এই পর্বে আইয়ুবের লৌহ শাসনের ভিত্ কাঁপিয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ '৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। প্রতি বছর জাতীয় জীবনে জানুয়ারি মাস ফিরে এলে '৬৯-এর গণআন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলো স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে। জীবনের সেই সোনালী দিনগুলির প্রতিটি মুহূর্তের কথা মনে পড়ে। অনেক সময় ভাবি, কী করে এটি সম্ভব হয়েছিল!

'৬৬-'৬৭তে আমি ইকবাল হল (শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্র সংসদের সহসভাপতি এবং '৬৭-'৬৮তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ তথা ডাকসু'র সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালীর জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সূতিকাগার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে '৬০-এর দশকের গুরুত্ব অনন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই '৪৮ ও '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা ও '৬৯-এর ১১ দফা আন্দোলন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যখন ৬ দফা দেন আমি তখন ইকবাল হলের সহসভাপতি। ইকবাল হলের সহসভাপতির কক্ষ ছিল ৩১৩ নম্বর। এই কক্ষে প্রায়শই অবস্থান করতেন শ্রদ্ধেয় নেতা মণি ভাই, সিরাজ ভাই এবং রাজ্জাক ভাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দেওয়ার পর আমাদের বলতেন, 'সাঁকো দিলাম স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।' অর্থাৎ এই ৬ দফার সিঁড়ি বেয়ে তিনি স্বাধীনতায় পৌঁছবেন। বিচক্ষণ নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাজনীতি করেছেন। স্বাধীনতার লক্ষ্য সামনে নিয়েই '৪৮-এ ছাত্রলীগ ও '৪৯-এ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করে মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার বীজ রোপণ করে ৬ দফায় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার জাতির সামনে পেশ করেন। ৬ দফা দেওয়ার পর দেশের বিভিন্ন জেলায় বঙ্গবন্ধুর নামে ১০টি মামলা হয়। প্রতিটি মামলায় জামিন পেলেও ৮ মে নারায়ণগঞ্জ থেকে সভা করে ঢাকায় ফেরার পর 'পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে' তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ডাকে ৭ জুন সর্বাত্মক হরতালে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। '৬৮-এর ১৮ জানুয়ারি জেল থেকে মুক্তি পেলেও পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধুকে অজানা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা জানতাম না প্রিয়নেতা কোথায় কেমন আছেন। '৬৮-এর ১৯ জুন আগরতলা মামলার বিচার শুরু হলে আমরা বুঝতে পারি আইয়ুব খান রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুদণ্ড দেবে। আইয়ুব খান প্রদত্ত মামলার নামই ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য।' আমরা ছাত্রসমাজ এই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলি।

স্মৃতিকথা লিখতে বসে মনে পড়ছে, ডাকসুসহ ৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক ১১ দফার (যার মধ্যে ৬ দফা হুবহু অন্তর্ভূক্ত ছিল) ভিত্তিতে '৬৯-এর ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে ওঠার কথা। মনে পড়ে ১১ দফা আন্দোলনের প্রণেতা—ছাত্রলীগ সভাপতি প্রয়াত আব্দুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী; ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) সভাপতি প্রয়াত সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা; ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল্লাহ এবং এনএসএফ-এর একাংশের সভাপতি প্রয়াত ইব্রাহিম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মুন্সীর কথা। ছাত্রনেতাদের প্রত্যেকেই

ছিলেন খ্যাতিমান। আমি ডাকসু ভিপি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করি। আমার সঙ্গে ছিলেন ডাকসু জিএস নাজিম কামরান চৌধুরী। '৬৯-এর ১৭ জানুয়ারি ১১ দফা দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রথম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ডাকসু ভিপি হিসেবে আমার সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। গভর্নর মোনায়েম খান ১৪৪ ধারা জারী করেছিলেন। ছাত্রদের প্রতীজ্ঞা ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গের। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মিছিল নিয়ে রাজপথে এলাম। পুলিশ আমাদের উপর লাঠিচার্জ করে। ছাত্রলীগ সভাপতি আবদুর রউফ আহত হন। আমরা ক্যাম্পাসে ফিরে আসি। ১৮ জানুয়ারি পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট কর্মসূচী দেই। বটতলায় জমায়েত। যথারীতি আমি সভাপতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট। সকালে বটতলায় ছাত্র জমায়েতের পর খণ্ড খণ্ড মিছিল। সহস্র কণ্ঠের উচ্চারণ, 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, আইয়ুব খানের পতন চাই।' গতকালের চেয়ে আজকের সমাবেশ বড়। সেদিনও ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে এলে দাঙ্গা পুলিশ লাঠিচার্জ আর টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। ফিরে এলাম ক্যাম্পাসে। পরদিন ছিল রবিবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা। কর্মসূচী নেওয়া হলো ১৯ জানুয়ারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করবো এবং ১৪৪ ধারা ভাঙবো। আমরা মিছিল শুরু করি। শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল নিক্ষেপ। আজ আর কিছুই মানছে না ছাত্ররা। শঙ্কাহীন প্রতিটি ছাত্রের মুখ। গত দু'দিনের চেয়ে মিছিল আরও বড়। পুলিশ গুলি চালালো। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুল হক, বাড়ি দিনাজপুর, গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন রাজপথে। পরবর্তীতে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি শহীদ হন। পুলিশের নির্যাতন ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি সোমবার বটতলায় সমাবেশ। এদিন ১১ দফা দাবীতে ঢাকাসহ প্রদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ২০ জানুয়ারি '৬৯-এর গণআন্দোলনের মাইলফলক। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সমাবেশে যখন সভাপতির ভাষণ দিচ্ছি তখন মিল-কারখানা, অফিস-আদালত থেকে স্রোতের মতো মানুষ আসছে বটতলা প্রাঙ্গণে। সেদিন বলেছিলাম, 'যতদিন আগরতলা মামলার ষাড়যন্ত্রিক কার্যকলাপ ধ্বংস করে প্রিয় নেতা শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্ত করতে না পারবো, ততদিন আন্দোলন চলবে। স্বৈরশাসক আইয়ুব-মোনায়েম শাহীর পতন না ঘটিয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ ঘরে ফিরবে না।' ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ঘোষণা দিলাম। লক্ষ মানুষের মিছিল নেমে এলো রাজপথে। কোথায় গেল ১৪৪ ধারা! আমরা ছিলাম মিছিলের মাঝখানে। মিছিল যখন আগের কলাভবন বর্তমান মেডিকেল কলেজের সামনে ঠিক তখনই গুলি শুরু হয়। আমি, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী ও আসাদুজ্জামান (শহীদ) একসাথে ছিলাম। আমাদের লক্ষ্য করে এক পুলিশ ইন্সপেক্টর গুলি ছোঁড়ে। গুলি লাগে আসাদুজ্জামানের বুকে। সাথে সাথে ঢলে পড়েন আসাদ। আসাদকে ধরাধরি করে মেডিকেল কলেজের দিকে নেওয়ার পথে আমাদের হাতের উপরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। একজন শহীদের শেষনিঃশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। মৃত্যু এতো কাছে হাতের উপর! মেডিকেলের সিঁড়িতে আসাদের লাশ রাখা হয়। তাঁর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত শার্টটি সংগ্রামের পতাকা করে আমরা আসাদের রক্ত ছুঁয়ে শপথ নিয়ে সমস্বরে বলি, 'আসাদ তুমি চলে গেছো। তুমি আর ফিরে আসবে না আমাদের কাছে। তোমার রক্ত ছুঁয়ে শপথ করছি, আমাদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা মায়ের কোলে ফিরে যাবো না।' এরপর শহীদ মিনার চত্বরে গিয়ে শোকার্ত জনতার মাঝে আসাদের মত্যুর খবর ঘোষণা করি। আসাদের রক্তাক্ত শার্ট উড্ডীন রেখে ছাত্র-জনতার সমাবেশের উদ্দেশে বলি, 'আসাদের এই রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেবো না।' ২১ জানুয়ারি পল্টনে আসাদের গায়েবানা জানাজা ও ১২টা পর্যন্ত হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করি। সেদিন আমাদের সত্তা ও অস্তিত্ব আসাদের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শহীদ মিনার থেকে শুরু হওয়া শোক মিছিল মুহূর্তেই লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হয়।

ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। শোক মিছিল যখন ৩ নেতার সমাধির কাছে তখন সেনাসদস্যরা মাইকে বলছে, 'ডোন্ট ক্রস, ডেঞ্জার-ডেঞ্জার, ডোন্ট ক্রস!' শোক মিছিল ক্ষোভে উত্তাল। 'ডেঞ্জার' শব্দের কোন মূল্যই নেই, মিছিল নির্ভয়ে এগিয়ে যায়। ২১ জানুয়ারি পূর্বঘোষিত হরতাল কর্মসূচী পালিত হয়। চারদিক থেকে মানুষের ঢল নামে পল্টন ময়দানে। মাইক, মঞ্চ কিছু ছিল না। চারাগাছের ইটের বেস্টনির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় ৩ দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করি: ২২ জানুয়ারি শোক মিছিল, কালো ব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা উত্তোলন। ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিল, কালো পতাকাসহ শোক মিছিল। ২৪ জানুয়ারি দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল। ২২ জানুয়ারি প্রত্যেকের বুকে কালো ব্যাজ; একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া বাড়ি-গাড়ি-অফিস সর্বত্র কালো পতাকা। ২৩ জানুয়ারি সমস্ত অলিগলি থেকে স্বতঃস্ফূর্ত মশাল মিছিল। সমগ্র ঢাকা পরিণত হয় মশালের নগরীতে। ২৪ জানুয়ারি সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। সর্বত্র মানুষের একই প্রশ্ন, 'শেখ মুজিব কবে মুক্তি পাবে?' 'কবে আগরতলা মামলা তুলে নেওয়া হবে?' হরতালের পর সমগ্র জনপদ গণঅভ্যুত্থানের প্রবল বিস্ফোরণে প্রকম্পিত, অগ্নিগর্ভ। জনরোষ নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখা যে কত কঠিন সেদিন তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। বিক্ষোভ দমনে সেনাবাহিনী-ইপিআর-পুলিশ মরিয়া হয়ে যত্রতত্র গুলি চালাতে থাকে। সে গুলিতেই শহীদের তালিকায় যুক্ত হয় মতিউর, মকবুল, আনোয়ার, রুস্তম, মিলন, আলমগীর, আনোয়ারাসহ আরও বহু নাম। লক্ষ মানুষ নেমে আসে ঢাকার রাজপথে। মানুষের পুঞ্জিভূত ঘৃণা ভয়ঙ্কর ক্ষোভে পরিণত হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষ ভয়াল গর্জনে সরকারী ভবন ও সরকার সমর্থিত পত্রিকাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। 'দৈনিক পাকিস্তান', 'মর্নিং নিউজ' এবং 'পয়গাম' অফিস ভস্মীভূত হয়। আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস রহমান বাসভবন থেকে একবস্ত্রে পালিয়ে যায়। নবাব হাসান আসকারি, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য এনএ লস্কর এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধকারী খাজা শাহাবুদ্দীনসহ আরো কয়েক মন্ত্রীর বাসভবনে আগুন দেওয়া হয়।

ঢাকার নবকুমার ইন্সটিটিউশনের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমানের লাশ নিয়ে আমরা পল্টনে যাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে পল্টন ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার পর বিক্ষুব্ধ জনতা গভর্নর হাউস আক্রমণে উদ্যত হয়। বিনা মাইকে বক্তৃতা করে জনতাকে শান্ত করি। গণমিছিল করে মতিউরের লাশ নিয়ে ইকবাল হলের মাঠে আসি। যে মাঠে এসেছিলেন সদ্য-সন্তানহারা শহীদ মতিউরের পিতা জনাব আজহার আলী মল্লিক। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেছিলেন, 'আমার ছেলে চলে গেছে দুঃখ নাই। কিন্তু আমার ছেলের রক্ত যেন বৃথা না যায়।' যখন ইকবাল হলে পৌঁছাই তখন রেডিওতে ঘোষিত হয় ঢাকায় কারফিউ। মতিউরের পকেটে এক টুকরো কাগজে নাম-ঠিকানাসহ লেখা ছিল, 'মা-গো, মিছিলে যাচ্ছি। যদি ফিরে না আসি মা, মনে কোরো তোমার ছেলে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য জীবন দিয়েছে। ইতি- মতিউর রহমান, ১০ম শ্রেণী, নবকুমার ইন্সটিটিউশন। পিতা- আজহার আলী মল্লিক, ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনি, মতিঝিল।' কারফিউর মধ্যেই মতিউরের লাশ নিয়ে ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনীতে পৌঁছাই। আমরা পিতামাতার আকুল আর্তনাদের আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু মা শুধু আঁচলে চোখ মুছে বলেন, 'আমার ছেলে চলে গেছে দুঃখ নাই! আজ থেকে তুমি আমার ছেলে। মনে রেখো, যে জন্য আমার ছেলে রক্ত দিয়ে গেলো, সেই রক্ত যেন বৃথা না যায়।'

'৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি গণআন্দোলন-গণবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান। কারফিউর মধ্যে একদিনও থেমে থাকেনি আমাদের সংগ্রাম। কলকারখানা, অফিস-আদালত, সচিবালয় সর্বত্র মানুষ পাকিস্তানের প্রশাসন বর্জন করেছে, প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। সরকারী কর্মকর্তাগণ জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের জন্য ধর্ণা দিতেন ইকবাল হলে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের কাছে। কিছুদিনের জন্য ছাত্র-জনতার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ইকবাল হল। এরপর সান্ধ্য আইন প্রত্যাহৃত হলে ৯ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ 'শপথ

দিবস' পালন করে। শপথ দিবসে আমার সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। আমরা ১০ জন ছাত্রনেতা 'জীবনের বিনিময়ে হলেও ১১ দফা দাবী বাস্তবায়ন করবো' জাতির সামনে এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করার শপথ নিয়ে স্লোগান তুলি, 'শপথ নিলাম শপথ নিলাম মুজিব তোমায় মুক্ত করবো, শপথ নিলাম শপথ নিলাম মা-গো তোমায় মুক্ত করবো।' '৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি প্রিয় নেতাকে মুক্ত করে স্লোগানের প্রথমাংশ এবং '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তান হানাদারদের কবল থেকে প্রিয় মাতৃভূমিকে মুক্ত করে স্লোগানের দ্বিতীয়াংশের পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছি। ১৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালন ও ডাকের জনসভায় জনতার দাবীর মুখে প্রিয় নেতার ছবি বুকে ঝুলিয়ে বক্তৃতা করি। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহার হত্যাকাণ্ডের পর পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সংগ্রামী ছাত্র-জনতা আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও প্রিয় নেতা শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে উত্তাল হয়ে ওঠে। মানুষ ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে প্রিয়নেতাকে মুক্ত করতে চায়। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভা থেকে স্বৈরশাসকের উদ্দেশে আলটিমেটাম প্রদান করে বলি, '২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রিয়নেতা শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।' ২২ ফেব্রুয়ারি তথাকথিত লৌহমানব আইয়ুব খান আমাদের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করে বঙ্গবন্ধু মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তিদানে বাধ্য হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদিন। সেদিন সদ্যকারামুক্ত প্রিয় নেতাকে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়। স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে সেদিনের ছবি। রেসকোর্স ময়দান ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ, জনসমুদ্র। মহান নেতার গণসংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছিল। চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করে আগেই সভাপতির ভাষণ প্রদানের অনুমতি চেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুরোধ জানাই। দশ লক্ষাধিক লোক দু'হাত তুলে সম্মতি দেয়। বক্তৃতায় আমি বঙ্গবন্ধুকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে বলি, 'প্রিয় নেতা, তোমার কাছে আমরা ঋণী, বাঙালি জাতি চিরঋণী। কারণ তুমি জেল-জুলুম অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছো। তোমার জীবন তুমি বাঙালি জাতির জন্য উৎসর্গ করেছো প্রিয় নেতা। এই ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না। তাই কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে একটি উপাধি দিয়ে সেই ঋণের বোঝাটা আমরা হালকা করতে চাই।' দশ লক্ষাধিক লোক দু'হাত উত্তোলন করে সম্মতি জানাবার পর সেই নেতাকে—যিনি জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে, ফাঁসির মঞ্চে দাড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন—'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করি। তুমুল করতালিতে মুখরিত জনসমুদ্র আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলেছিল, 'জয় বঙ্গবন্ধু।'

সেদিন ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে বাংলার মানুষ সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করেছে। সোনালী সেই দিনগুলির কথা ভাবলে গর্বে বুক ভরে ওঠে। আমরা মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছি। শহীদ মতিউরের মা ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেছিলেন, 'আমার সন্তানের রক্ত যেন বৃথা না যায়।' শহীদ মতিউরের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেইনি। ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদের বীরোচিত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলন রক্তে রঞ্জিত হয়, সেই আন্দোলনের সফল পরিণতি বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, '৭০-এর নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্তি, পরিশেষে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে মহত্তর বিজয় অর্জন। আর এসব অর্জনের ড্রেস রিহার্সেল ছিল '৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থান—যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এবং থাকবে চিরদিন।

লেখক: সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ; সংসদ সদস্য।
tofailahmed69@gmail.com